পুনর্মিলন ২০০২ । পাঠভবন, শান্তিনিকেতন

পুনর্মিলন ২০০২

পাঠভবন ॥ শান্তিনিকেতন

মুদ্রক
ঋতেশ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
'টিউলিপ' অফসেট প্রিন্টার্স
বোলপুর, বীরভূম
ফোন : ৫৪৩০২

পুনর্মিলন ।। পাঠভবন, শান্তিনিকেতন

অনুষ্ঠান সূচী

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২, শনিবার

সকাল ৯'০০ নাম নথীভুক্তিকরণ

দুপুর ১২'০০ মধ্যাহ্নভোজন

দুপুর ২'০০ পরিচয় পর্ব

দুপুর ৩'০০ উদ্বোধন অনুষ্ঠান এবং শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন

বিকেল ৪'০০ খেলা

বিকেল ৫'১৫ চা-জলখাবার

সন্ধ্যা ৬'০০ আলোকসজ্জা

সন্ধ্যা ৬'৩০ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রাত্রি ৮'০০ নৈশাহার

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২, রবিবার

ভোর ৫'৩০ বৈতালিক

সকাল ৭'১৫ প্রাতঃরাশ

সকাল ৮'০০ পরিচয় পর্ব

সকাল ৯'০০ আলোচনা-প্রশ্নোত্তরের আসর

সকাল ১১'০০ চা বিরতি

সকাল ১১'১৫ নির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সকাল ১১'৪৫ আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি

দুপুর ১২'০০ মধ্যাহ্নভোজন

পত্রাঙ্ক

ভূমিকা ১
ঋতেন মজুমদার পঠিত ভাষণ ৩
ছড়া ঃ ঠাণ্ডায় আণ্ডা, বৃষ্টি ৬
রম্যরচনা ঃ ঘুষ ৭
স্মৃতিকথা ঃ কবির স্বপ্ন ১০
ছবি ঃ বৈতালিক ১২
কবিতা ঃ প্লেগ ১৩
ছবি ঃ ক্লাস ১৫
রম্যরচনা ঃ ভোলাকাকাদের গল্প ১৬
কবিতা ঃ পথেই হবে এ পথ চেনা ১৭
ছড়া ঃ বিশ্বনাথদার কিল ১৮
স্মৃতিকথা ঃ বাঁধা যে তা'র সুরে ২০
ছড়া ঃ আমি, রস পাটালির নলের গুড় ২২
কবিতা ঃ চেনা ২৩
স্মৃতিকথা ঃ ক্ষতিপূরণ ২৪
আশ্রম বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কার্যাবলী ২৬

ভূমিকা

আশ্রম বিদ্যালয় পাঠভবনের শতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি রচনা এবং কবিতার সংকলন। পুস্তিকাটি পাঠভবনের পুনর্মিলন উৎসব (২০০২) উপলক্ষে প্রকাশিত হল।

ব্যবহৃত ফটোচিত্রদুটি রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রকাশনা উপসমিতি

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ — পুনর্মিলন উৎসব ২০০২

পাঠভবনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব উপলক্ষে আম্রকুঞ্জে পঠিত

ঋতেন মজুমদার

বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক সুজিতকুমার বসু মহাশয় যখন আশ্রম বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে, আমাকে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ জানান, আমি সানন্দে তা গ্রহণ করি। কারণ আমার জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য। আজ ৭ই পৌষের পুণ্যদিনে আমরা যারা আশ্রম বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সাক্ষী হয়ে রইলাম, তাদের মতো ভাগ্যবান ক'জন আছেন? আমাকে এই সম্মান জানানোয় আমি অধ্যাপক বসু এবং পাঠভবনের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রথমেই বলি, আমি সুবক্তা নই। যাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে আমি আমার অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের বিশেষ অনুরোধ, পাঠভবনের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু বলতেই হবে। অগত্যা রাজী হওয়ায় তোমাদের দু-চার কথা বলছি।

চল্লিশ দশকের গোড়ায় আমি পাঠভবনের আবাসিক ছাত্ররূপে চতুর্থ বর্গে ভর্তি হই। আমাদের সময় এখনকার মতো শ্রেণী বলার প্রথা ছিল না। বলা হত বর্গ। এখন যা দশম শ্রেণী আমাদের সময় তা ছিল প্রথম বর্গ। সে সময় পাঠভবনের রেক্টর ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনী। শান্তিদার ছোটো ভাই ভুলু, বাচ্চু ক্ষমা, বিশ্বজিৎ, সুনীল, বাণী, পুটলু, সুসীমা এরা সবাই আমার সহপাঠী ও সহপাঠিনী। সকলের নাম আজ আর মনে নেই। বিদ্যালয়ে নূতন ভর্তি হওয়ার সুবাদে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তিনি তখন বয়সের ভারে ক্লান্ত, মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তা সত্ত্বেও বিকেলবেলা গাড়ি করে মাঝেমাঝে খেলার মাঠের ধারে এসে বসতেন, ছেলেদের দেখতেন খোঁজখবর নিতেন। একবার ভুলু আর আমি গেলাম ওঁর অটোগ্রাফ নিতে। গিয়ে দেখি উনি লিখছেন 'ছেলেবেলা'। বললেন, "তোদের জন্য একটা বই লিখছি, পরে আসিস্।" শুধু নাম সই করে দিলেন।

আমার স্বল্প বিদ্যালয় জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে, হস্টেলে খুব ভোরবেলা উঠতে হত। প্রথমে একসারসাইজ। তারপর তেল মেখে স্নান, সাবানের তেমন বালাই ছিল না। বড় বড় চৌবাচ্চায় খোলা আকাশের নীচে সারারাত জল জমা থাকত। শীতকালের কনকনে ঠাণ্ডায় ঐ জল নিজের গায়ে ঢালতে পারা যেত না। ছোটো ছোট বালতি ছিল, তা নিয়ে জল ভরে প্রথমে এ ওর গায়ে জল ছুঁড়ে দিতাম।

স্নানের পর রোজ পঞ্চতিক্ত আসত হাসপাতাল থেকে। যাতে খেতে না হয় তার জন্য চলত নানা কলাকৌশল। তারপর জলখাবার খেয়ে বৈতালিকে যাওয়া। আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা একবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যসভার সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। গুরুদেবের মৃত্যুর পর, তিনি সেবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আমি তখন সাহিত্য সভার সম্পাদক। আমাদের প্রস্তাব শুনে তিনি কি খুশী। বললেন, "নিশ্চয়ই যাব।" আমি সুযোগ বুঝে আমার অটোগ্রাফের খাতাটা এগিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। সম্পাদকের ইচ্ছাপূরণ করার আগে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ক্লাসে পড়িস?" বললাম, সেকেন্ড ক্লাসে। খাতায় একটা বইয়ের ছবি এঁকে কবিতা লিখে দিলেন —

কী লিখব বল?
ছবি না জল,
কুঁজো না গেলাস
সেকেন্ড ক্লাস না ফার্স্ট ক্লাস!

তোমরা তাঁর লেখা নালক, রাজকাহিনী, আলোর ফুলকি নিশ্চয়ই পড়েছ। কি সুন্দর! একেবারে ছবির মতো লেখা। আমাদের মধ্যে বাচ্চু, ক্ষমা এরা ভালো গান গাইত৷ বাচ্চু পাঠভবনে পড়ত আবার সঙ্গীতভবনেও পড়ত। পরবর্তীকালে সে একজন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে ও বিশেষজ্ঞা রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ক্ষমা কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন পাঠভবনে শিক্ষকতা করেছে। আমাদের মাস্টারমশাইদের মধ্যে গোঁসাইজী, নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী বাংলা পড়াতেন। অঙ্ক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনি খেলাধূলায় খুব পটু ছিলেন। ভূগোল, ইতিহাস পড়াতেন প্রমদারঞ্জন ঘোষ মশাই, যাঁকে আমরা মশাই বলে ডাকতাম। ইংরেজী তনয়দা, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। তনয়দা লাইব্রেরী থেকে ইরেজি বই এনে গল্প শোনাতেন। একটা ইন্টেরেস্টিং জায়গায় এসে গল্পটা আর বলতেন না। ভুলু আর আমি লাইব্রেরী থেকে বইটা ইস্যু করে বাকি অংশটা পড়ে নিতাম। এই করে আমাদের বই পড়তে শিখিয়েছিলেন।

আমার ছেলেবেলার কথা শুনে তোমাদের মনে হতে পারে আমরা বোধহয় খুব সুবোধ বালক ছিলাম। বাস্তবে কিন্তু মোটেই তা নয়। ঐ বয়সের যা যা দুষ্টুমি সবই করতাম। আমপাড়া, আচার চুরি করে খাওয়া, আরো কত কী। তার জন্য মাঝে মাঝে শাস্তিও পেতে হতো। সব মিলিয়ে পাঠভবনে আমাদের ছাত্রজীবনে একটা সহজ সরল সুন্দর ছন্দোময় জীবন ছিল। তার সমস্ত ইতিহাস সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়। সেই সুখস্মৃতি মাঝে মাঝে আজও মনে এসে ভীড় করে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি ১৯৪৬ সালে যখন কলাভবনে ভর্তি হয়েছি তখন শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতী মানুষজনকে। এ সব

গুরুদের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

তোমরা যারা গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় পাঠভবনে শিক্ষাগ্রহণ করছ, তোমরা যে কতবড় সৌভাগ্যবান তা এখন বুঝতে পারবে না। বড় হলে বুঝতে পারবে এখান থেকে কী পেয়েছ। গুরুদেব নেই, কিন্তু মনে রেখো এই আশ্রমে তাঁর আশীর্বাদ প্রতিনিয়তই তোমরা পাচ্ছ। আশ্রমের এই উন্মুক্ত আকাশ, শালবীথি, বকুলবীথি, আম্রকুঞ্জ যেখানে গুরুদেব ক্লাস নিয়েছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন, এখনও সেখানেই তোমরা ক্লাস করছ, দৌড়াচ্ছ, খেলছ, আনন্দে মন ভরিয়ে তুলছ। প্রকৃতির কোলে তোমাদের এমনভাবে বড় হয়ে ওঠা কখনোই বিফল হতে পারে না। আজও পাঠভবন বিশ্বভারতীর প্রাণ। তোমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার মধ্যে, এখনও গুরুদেবের শিক্ষাদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে সাহিত্যসভা, সেবা বিভাগের কাজ - গ্রাম পরিদর্শন সহ আশ্রম সম্মিলনীর বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে এখনও পালন করছ। সেটাই আমাদের কাছে 'আশার কথা'।

বর্তমানে সারা বিশ্বে অশান্তির ঝড় উঠেছে। তার ঢেউ এই আশ্রমেও লেগেছে। মানুষের ভীড় বাড়ছে। সমস্যা বেড়েছে। তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে এক অশুভ প্রতিযোগিতা আজ শিশুমনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। অনেক অভিভাবক তার পেছনে ছুটছেন। আজকের দিনে শিক্ষায় উৎকর্ষতা লাভের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু মনে রেখো মরা মন নিয়ে উচ্চপদ লাভ করলেও জগৎকে পাওয়া যায় না। এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তাকে জানব না, চিনব না, ভালবাসব না তা তো হতে পারে না।

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে গড়ে ওঠা, তোমাদের সজীব সুন্দর মন কখনই যেন শুকিয়ে না যায়। এই অনন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের ভিতর দিয়ে তোমাদের চিত্তের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হউক, তোমরা পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠো। বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তির পুণ্যলগ্নে, এই আশীর্বাদ করি।

এই ছোট্ট লেখাটি লিখতে পাঠভবনের শিক্ষক শ্রীসুব্রত সেনমজুমদার আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হত না।

ঠান্ডায় আণ্ডা

দ্বীপেশ রায়চৌধুরী

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা খেতে চাই আণ্ডা
পাবো কী?
দোকান তো বন্ধ তুমিও কি অন্ধ
খাবো কী?
গায়ে লাগে ঠাণ্ডা জোটেনা তো আণ্ডা
খাই কি?
মনে মনে তাই ভাবি হাতে কেন নেই চাবি
চাবি - পাই কি?
বসে আছে পাণ্ডা দেখতে ষন্ডা
চেনো কি ?
ধরে ফেলে পাণ্ডা খেতে চায় আণ্ডা
বলি, করো কি?
বৃথা লোভ আণ্ডা প্রাণ যায় ঠাণ্ডায়
বোঝ কি?

বৃষ্টি

সৌমিনী হালদার

ঘন মেঘ জমলো আকাশে
মন ভরে যায় ঠান্ডা বাতাসে
কিছু পরে শুরু হবে বৃষ্টি
গাছপালার দিকে চলে যাবে দৃষ্টি
চারিদিক ভরবে জলে
ব্যাঙেরা ডাকবে স্থলে।

ঘুষ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ লিখতে বসতে হলো কাগজ কলম নিয়ে। এমন জায়গা থেকে আবদার এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই আবদার নিয়ে এসেছে যারা তারা হলো ৪০-৫০ বছর আগে আমি যে পাঠভবনে পড়তাম সেখানকার ছাত্রী। তাদের আবদার পাঠভবনে পড়াকালীন একটি দুষ্টুমি ও মজার ঘটনা লিখতে হবে এবং সেটা সাহিত্যসভায় পড়তে হবে। স্মৃতির পঞ্জিকা থেকে একটা ঘটনা লিখতে আরম্ভ করলাম।

আমার মনে পড়ছে সেই সময় আমি পাঠভবনে চতুর্থ বর্গে পড়ি। আমরা চার সহপাঠী হরিহরআত্মা। নিন্দুকেরা আড়ালে বলত দুষ্টচতুষ্টয়। চার বন্ধুর দুইজন এখন পরলোকে। নামগুলি তোমাদের বলি, প্রথম জন স্বর্গীয় বসু মিত্র, দ্বিতীয় জন স্বর্গীয় রণধীর রায় (টুকু) তৃতীয় জন আমি বেণু ও চতুর্থ জন তোমাদের অতি প্রিয় ও কাছের শিক্ষক মনোরঞ্জন ঘোষ (খোকা)। এরা সবাই ফুটবল খেলায় প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। আর যাঁরা আমার এই গল্পের মধ্যে আসবেন তাঁরা সবাই পরলোকে।

গোঁসাইজী ছিলেন আমাদের বাংলার শিক্ষক, তনয়দা ছিলেন ইংরেজির শিক্ষক, নিরঞ্জনদা ছিলেন পাঠভবনের অধ্যক্ষ, প্রভাকরদা ছিলেন পাঠভবনের পিয়ন আর উপেনদা ছিলেন শিক্ষাভবনের বাংলার অধ্যাপক। তাঁর কোয়ার্টার ছিল শ্রীপল্লীর সাঁতার পুকুরের ধারে। আর হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য ছিল আমাদের সহপাঠী, তার কোয়ার্টার ছিল গুরুপল্লীতে গোঁসাইজীর কোয়ার্টারের পাশে। আমরা বাংলায় কাঁচা থাকার জন্য গোঁসাইজী আমাদের বিকেলে প্রথম পর্বে কোচিং ক্লাস নিতেন। তাঁর ক্লাসে কেউ কামাই করলে পরের দিন অবশ্যই বাবা কিংবা মায়ের লেখা চিঠি নিয়ে যেতে হতো।

বিচিত্রা সিনেমা হলে ভালো বই এসেছে নাম, 'দস্যু মোহন'। কিন্তু পয়সা কোথায়? বসু ভুবনডাঙ্গার এক বন্ধুর মাধ্যমে কোন একটা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করলো তাদের একটা ম্যাচ খেলতে হবে। খেলাটা হবে লাভপুরে। এর জন্য দশ টাকা বায়না পাওয়া গেল। খেলার দিন পড়লো মঙ্গলবার বিকেল ৩.৩০ মিনিটে। মঙ্গলবার পঞ্চম পর্ব ফাঁকি দিয়ে এগারোটার ট্রেন ধরে লাভপুর পৌঁছলাম। ওখানে খেলা শেষ করে ট্রেন ধরে বোলপুরের দিকে রওনা হলাম। গাড়ী বোলপুর এলো। ট্রেন থেকে নেমে সোজা বিচিত্রা। টিকিট কেটে মনের আনন্দে সিনেমা দেখে ভুবনডাঙ্গায় বন্ধুর বাড়ি থেকে বই খাতা নিয়ে রাত্রি নটায় বাড়ি ঢুকলাম। বাড়িতে আগে থেকে বলা ছিল বন্ধুর দিদির বিয়ে স্কুল শেষে নিমন্ত্রণ খেতে যাবো, তাই বাড়ির লোকেরা কিছু আর বললো না। পরের দিন বুধবার, ছুটির দিন। বৃহস্পতিবার বিকেলে গেলাম গোঁসাইজীর ক্লাসে; সে

দিন ক্লাস করতে দিলেন, কিন্তু এও বলে দিলেন পরের দিন বাবা অথবা মা'র চিঠি অবশ্যই চাই, নচেৎ বাবা মা'র কাছে বলে দেবেন — সর্বনাশ! তাহলে তো পিঠের চামড়া থাকবে না। হরিপ্রসাদ এর শরণ নিলাম। অনেক ধরাধরির পর হরিপ্রসাদ বললো, "গোঁসাইজী পাকা পেঁপে খেতে খুব ভালবাসেন, তোমরা ওনাকে পাকা পেঁপে এনে দিলে উনি নিশ্চয়ই তোমাদের দোষ মাপ করে দেবেন।" হালে পানি পেলাম। মনে পড়লো কয়েক দিন আগে সাঁতার পুকুরে স্নান করতে গিয়ে নজরে পড়েছিল উপেনদার চারটে পেঁপে গাছে বড় বড় অজস্র পেঁপে ধরে আছে। তার মধ্যে কিছু কিছু পেঁপেতে রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে। ঠিক হয়েছিল কয়েকদিন পর ওগুলোর সদ্গতি করবো। এবার মত পালটে ঠিক হল উপেনদার গাছের পেঁপে গোঁসাইজীকে দেওয়া হবে। পরিকল্পনা হয়ে গেল। বিকেলের দিকে আমরা চার বন্ধু শ্রীপল্লীর উপেনদার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। শ্রীপল্লীর মোড়ে এসে রাস্তা ধরে আমি উপেনদার বাড়ির সামনে এলাম, ওরা সাঁতার পুকুরের পাড় ধরে উপেনদার বাড়ির পিছন দিকে গেল। উপেনদা বারান্দায় বসেছিলেন, আমাকে দেখে তো মহা খুশি। বললাম, "মা খবর নিতে পাঠিয়েছেন।" একথা সেকথা হতে হতে শ্রীপল্লীর মোড় থেকে একটা সিটির আওয়াজ এলো। বুঝলাম কাজ ভালভাবে হাসিল হয়ে গেছে। আর এখানে এক মিনিটও থাকা ঠিক নয়। খেলার মাঠ আছে বলে ওখান থেকে সরে পড়লাম। মোড়ে এসে দেখি তিন বন্ধু চারটি পেঁপে নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর দেরি না করে তিন জন ডান দিকের বুকে তিনটি পেঁপে চেপে ধরে আর একজন বাঁ দিকের বুকে একটি পেঁপে চেপে ধরে সঙ্গীতভবন ঘুরে গুরুপল্লীর উদ্দেশে রওনা দিলাম। পড়ন্ত বেলায় বাড়ির সামনের চাতালে একটা আসন পেতে বসে গোঁসাইজী খুব মনোযোগ দিয়ে তালপাতার পুঁথি পড়ছেন, আরেকটা খাতায় কি সব লিখছেন। পাশে গোঁসাইজীর খড়ম জোড়া। এতোই মনোযোগ দিয়ে পুঁথি পড়ছেন যে আমাদের উপস্থিতি উনি টের পাননি। কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর বসু ছোট্ট করে কাশল। পুঁথিতে মুখ রেখে উনি বললেন, "কে?" নিজেদের নাম বললাম। বললেন, "কী দরকার?" বললাম, "মঙ্গলবার ক্লাসে আসিনি বলে আপনি পরের ক্লাসগুলিতে ঢুকতে দিচ্ছেন না।" জবাব, "বাবার চিঠি আনলেই ঢুকতে দেবো।" বসু খুব ভালো গৌরচন্দ্রিকা করতে পারতো। নানাভাবে বুঝিয়ে ওনাকে বাগে আনার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ওনার গোঁ থেকে একচুলও নড়ানো গেল না। খোকা এতক্ষণ চুপচাপ পেঁপে হাতে নিয়ে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ধৈর্যের চ্যুতি ঘটলো, পেঁপে সমেত বাঁ হাতটা গোঁসাইজীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "অমন কেন করছেন এই পেঁপেটা না হয় ঘুষ নিন।" এবার গোঁসাইজী পুঁথি থেকে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে হলো চোখ থেকে আগুন বেরোতে আরম্ভ করবে। যদি কালটা কলি না হয়ে দ্বাপর কিংবা ত্রেতা হতো তাহলে আমরা ভস্ম

হয়ে যেতাম। মনে হলো প্রাণ নিয়ে যদি বাঁচতে হয় তো তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালানো উচিত। পৃষ্ঠপ্রদর্শনের জন্য যেই ঘুরেছি সাঁ করে কানের পাশ দিয়ে কী একটা যেন সামনে গিয়ে পড়ল, দেখি গোঁসাইজীর একপাটি খড়ম। পরের দিন দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে প্রভাকরদা সমন নিয়ে হাজির, তাতে লেখা আমাদের চারজনকে টিফিনে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে হবে। টিফিনে দুরু দুরু বক্ষে মাথা চুলকাতে চুলকাতে অধ্যক্ষের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ভেতরে দেখি গোঁসাইজী একটা চেয়ারে অধ্যক্ষের পাশে বসে আছেন। দু'জনের মুখ দারুণ গম্ভীর। ভগবান সহায় থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। ঠিক সেই সময় তনয়দা অধ্যক্ষের অফিসে ঢুকলেন। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিরঞ্জনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নিরঞ্জন এরা আজ কত ধারার আসামী?" নিরঞ্জনদা উত্তর দিলেন, "আর বলবেন না তনয়দা, এদের বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে অভিযোগ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা। জানেন এরা মঙ্গলবার গোঁসাইজীর ক্লাস ফাঁকি মেরে বৃহস্পতিবার বিকেলে গোঁসাইজীর বাড়ি গিয়ে গোঁসাইজীকে একটা পাকা পেঁপে দিয়ে বলেছে এই পেঁপেটা ঘুষ নিয়ে ওদের অপরাধ মাপ করে দিতে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবো যাতে ওদের বিরুদ্ধে সব সময় লোকের নালিশ শুনতে না হয়।" তনয়দা গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, "শোন হে জগদানন্দ দাদা গাধাকে পিটিলে নাহি হয় ঘোড়া, ঘোড়াকে পিটিলে গাধা।" সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজীর গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটতে আরম্ভ করলো, বলে উঠলেন, "আপনার ঐ কথাটা এখনো মনে আছে?" ঘটনাটা ওদের তিনজনের কথোপকথন থেকে জানতে পারলাম। জগদানন্দ রায় এঁদের সঙ্গে শিক্ষকতা করতেন। পাঠভবনে, একবার উনি একটি দুষ্টু ছেলেকে ভীষণ মেরেছিলেন, ছেলেটি গুরুদেবের কাছে নালিশ করেছিল। গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে একটা চিরকুট লিখে বনমালির হাতে দিয়ে জগদানন্দ রায়কে পাঠিয়েছিলেন, তাতে ঐ কথাগুলি লেখা ছিল। যাই হোক তনয়দা আমাদের দিকে ঘুরে বলে উঠলেন, "পাজি ছেলে, হাত জোড় করে গোঁসাইজীর কাছে ক্ষমা চাও।" সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাত জোড় করে বললাম, "আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে, আর করবো না।" গোঁসাইজী বললেন, "কাল থেকে ক্লাসে এসো আর কখনো এমন কোরো না।" অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরোচ্ছি, "দাঁড়াও", গোঁসাইজী পিছু ডাকলেন। আবার কী হলো, ঘুরে দাঁড়াতে বললেন, "টিফিনে বাড়িতে খেতে যেতে পার নি?" মাথা নাড়লাম। পাশে রাখা থলেটার থেকে আগের দিনের চুরি করা দুটি পাকা পেঁপে বের করলেন, বললেন, "এগুলো ভালো করে ধুয়ে খাও।" বেরবার সময় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে বাঘের চোখের যেমন চেহারা হয়, অধ্যক্ষ মহাশয়ের চোখ জোড়া সেই রকম দেখতে লাগছিল। অফিস থেকে পেঁপে হাতে বেরিয়ে সোজা লাইব্রেরীর পশ্চিমে সেগুন তলার বেদিতে বসলাম দম নিতে।

কবির স্বপ্ন

আলপনা রায়

অল্প কয়েকবছর আগে, তখনকার অধ্যক্ষের আগ্রহে পড়াতে এসেছি পাঠভবনে। সম্ভবত অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস, বিষয় : রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। পড়াতে যাবার আগে সতর্কবাণী শুনেছি, ভবনের বাইরে থেকে পড়াতে এলে ছেলেমেয়েদের সামলানো কঠিন, বিশেষ এই ক্লাসটির দুষ্টুমির খ্যাতিও শুনিয়েছেন কেউ কেউ। নিজের শিক্ষালয়ে নিজেকে 'বাইরের লোক' ভাবতে একটু অস্বস্তিই হয়, আর একদা পাঠভবনের ছাত্রী হিসাবে দুষ্টুমিগুলোও খুব অপরিচিত হবে না, ধরেই নিয়েছিলাম। প্রথম-প্রথম একটু উশ্‌খুশ্, সংশয়ী দৃষ্টি, পরের ক্লাস থেকেই সহজ হয়ে এল সম্বন্ধ। পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে তাদের নানান প্রশ্ন : 'অমলের মতো ছেলে সত্যিই কি সম্ভব, কেমন যেন অস্বাভাবিক !' পড়ুয়ারা নিজস্ব যুক্তি দিয়ে তর্ক করে, আলোচনা হয়, শেষ পর্যন্ত অমলের স্বভাবসৌন্দর্য বোধকরি মেনেও নেয়, কিন্তু অমল তাদের কাছে দূরের মানুষ হয়েই থাকে। আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানের যুগে অমলের মতো কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি বিভোর কিশোর সত্য হয়ে ধরা দেয় না তাদের কাছে, এই প্রকৃতিময় শান্তিনিকেতনেও। অমলের জন্য হয়তো তারা ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু দোসর ভাবতে পারে নাস যেমন আমরা ভাবতাম সেই বয়সে। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি পড়াশোনা করে, অনেক জানে। অমলের 'পণ্ডিত' না-হবার আকুলতা ছোঁয় না তাদের।

এরই মধ্যে একদিন একটি ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সামনে যে খোলা বইটির প্রতি তার নিবিষ্ট মনোযোগ, সেটি 'ডাকঘর' নয়। জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেল, গত সন্ধ্যায় কোনো একটি অনুষ্ঠানে যেতে হয়েছিল বলে তৈরি হয়নি পরের ক্লাসের পরীক্ষার পাঠ, তাই —। বলার ভঙ্গি অবশ্য বিনম্র, কিন্তু শোনা গেল প্রায় সকলেরই অভিমানভরা মৃদু ক্ষোভ ঃ সারা বছর উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হলে পড়ব কখন! আজকের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভার অবশ্য অজানা নয়, তবু চকিতে মনে পড়ে গেল ছোটোবেলায় কোনো অনুষ্ঠানে যেতে না পারলে কী বিবন্নই লাগত ! কেমন ছিল সে-দিনগুলি?

সে-যুগে পাঠভবনের চরিত্রটি ছিল প্রধানত আবাসিক বিদ্যালয়ের। দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়েই কাটত। দু-বেলা ক্লাস ছাড়াও ভোরের বৈতালিক আর সাপ্তাহিক উপাসনা, খেলাধূলা আর সাহিত্যসভা, আশ্রম-পরিষ্কার আর দানসংগ্রহ

বনভোজন আর বেড়াতে যাওয়া, যে-কোনো উপলক্ষেই সাগ্রহে যুক্ত থাকত আবাসিক-অনাবাসিক সমস্ত ছাত্রছাত্রী, তার সঙ্গে ছিল শিক্ষক-শিক্ষকাদের আনন্দময় সহযোগ। ইস্কুলের প্রতিদিনের পড়া আর পরীক্ষার পাঠ তৈরি হতো ক্লাসেই, গুরুদের যত্নে, সতর্কতায়। গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হতো না প্রায় কারোরই, অভিভাবকরাও বিশেষ ভাবতেন না ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে। ভবনের বিভাগ বা সীমারেখা তখন এত প্রবল ছিল না, যাঁরা বড়োদের পড়াতেন কিংবা গান শেখাতেন, সেই শিক্ষা - বিদ্যা কিংবা সঙ্গীতভবনের দাদা-দিদিরাও নিয়মিত ক্লাস নিয়েছেন পাঠভবনে। সত্য অর্থেই 'বিশ্বভারতী'র যোগটি ছিল সুদৃঢ়। সেদিনের ছোট্ট শান্তিনিকেতনে ইস্কুলে আর তার বাইরেও শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ছিলেন আমাদের অভিভাবক, শাসনে আর স্নেহে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল নিবিড় আত্মীয়তা।

প্রকৃতি আর মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধের তত্ত্ব বা দর্শন বোঝার বয়স তখন নয়, কিন্তু প্রকৃতিকে পেয়েছিলাম পরম আত্মজনের মতো। প্রকৃতি-পরিচয়ের পাঠে যেমন, তেমনি প্রকৃতি থেকেও পেয়েছি প্রকৃতির পরিচয়। প্রকৃতি, নিজেই যেন এক শিক্ষাগুরু।

আজও যখন দেখা যায়, খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় পাঠচর্চা, এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে ছুটে চলার ছন্দ, উৎসবে-অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত উদ্যম, দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ-কাঙ্ক্ষিত সার্বিক শিক্ষার আয়োজন, প্রকৃতির চেহারা বদলে সঙ্গে শোনা যায় চলতে-ফিরতে শিশুকণ্ঠে বেজে উঠেছে ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুর গান, মনে হয় বদলায়নি পাঠভবন।

কিন্তু সত্যিই কি বদলায়নি কিছু? কী ক'রে অস্বীকার করা যায় রূঢ় বাস্তবকে?

তখনকার ছাত্রছাত্রী, যারা আজ অভিভাবক, তারাই চাইছি আমাদের সন্তান শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা নিয়ে আসুক, হয়ে উঠুক প্রতিযোগিতার শিরোমণি। নিজেদের বাসনা পূরণ করতে গিয়ে আমাদের সন্ততিদের আমরাই কি পৌঁছে দিচ্ছি না এক আতঙ্ক-জীবনে?

প্রতিযোগিতার অসুস্থ দৌড় থেকে, পরীক্ষামনস্কতা থেকে ছাত্রদের দূরে রাখতে চেয়েছিলেন এই আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। অবধারিত যে, প্রতিযোগিতায় সমান সফল হবে না সবাই, সবাই হবে না, গবেষক, সাহিত্যিক, চিত্র কিংবা সঙ্গীতশিল্পী। কিন্তু, আশ্রমগুরুর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল পাঠচর্চার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীদের মন হয়ে উঠুক বিশ্ব-সজাগ, গ'ড়ে উঠুক সাহিত্যবোধ, তৈরি হোক ছবি দেখার চোখ আর সুরের কান। এমন এক 'সম্পূর্ণ মানুষে'র কল্পনা ছিল কবির। হয়তো স্বপ্ন, তবু 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক্‌।'

ছবি ঃ রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে

প্লেগ

পারভেজ কবীর

আসল কথা আজব দেশপ্রেম
আসল কথা পূর্বপুরুষ পাপী,
তোমার কথাই বেদবাক্য দাদা
তোমার কথায় এই ইতিহাস মাপি,

তোমার কথায় সমাজ বড়ো হয়
খারাপ ভালো - নিয়ম মেনে ঘোরে
তোমার কথায় সবাই ইঁদুর হয়ে
এক রুটিতেই কামড়াকামড়ি করে।

তখন ভাবি, এতই সহজ-রোজ নিয়ম করে বৈতালিক ক'রে একটা খবরের
কাগজ হাতে পেয়ে দুটোকে মেলাতে পারা? এতই সহজ?
ধানের শিষও সাগর পাড়ি দেয়
মার্কিন দেশ বন্ধ্যাকরণ করে
সেই শিষও তো একটা বীজের মা
এক জমিতে লক্ষ মানুষ মরে।

যে ছেলেটা আজকেই জন্মেছে
বামিয়ানের চোরাগলির বাঁকে
কোন্ মার্কিন বিমান উড়ে গেলে
মানুষ বলে রেহাই দেবে তাকে ?

তখন মনে হয় এই যে শিক্ষার মাধ্যমে চেতনার সরলীকরণ করা হচ্ছে তা
সত্যিই প্রাসঙ্গিক তো - মানে — রাবণ যদি ভালোই হয়ে যেতো,
থাকত যদি একটা মাত্র মাথা
দশেরাতে জ্বলত আতশবাজী?
সত্যি হত গল্পে মালা গাঁথা?

রাম বা রাবণ এক মুদ্রার দু'পিঠ
নইলে পরে মুদ্রা অচল হবে
যাক্ না উঠে সীমান্ত যা আছে
তোমার আমার দুঃখ সমান হবে।
কারণ শোষক যদি শোষিতকে তোয়াজ করে, তাহলে শোষিত
আর তার হয়ে কাজ করে না। এটা আসলে প্রবৃত্তি - যা দুজনকে ভাই বানিয়ে দেয়।

কিন্তু ক'জন ভাইকে ভালোবাসে
সময় আছে একটা সুযোগ চাই
পনেরো জবাব কড়োড়্পতি করে
আর একবার ভাগ্য নিয়ে যাই —

এমনি করেই সময় ঘুরে চলে
শেকড়হীনে ভাগ্য ভিক্ষা নেয়
সকাল বিকাল কণ্ঠে আশার কথা
শিক্ষা সবার জীবন গড়ে দেয়।
আমার তো বাস্তবিকই মনে হয়, পাঠভবনের
যে ছেলেটা ইউক্যালিপ্টাসের ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়ায় তার সাইটোপ্লাজমে
কী কী ভেসে বেড়ায় জানার কোনো দরকার নেই। তাই বলি এস্টাবিলিশমেন্ট -

এই যে ক্যানেল, ছাতিম সিংহসদন
কোনটা তোমার কোনটা আমার ভাবি
ভাবনার জল খোয়াই বয়ে চলে
তোমার আমার বেড়েই চলে দাবী।

আর — সেই দাবীতেই চাঙ্গা নিউজপেপার
দেশের স্লোগান ছাপায় ছবির পাশে
ইঁদুর দৌড়ে প্লেগের বিষও ছড়ায়
রাত্রি নামে, রাত্রি নেমে আসে।

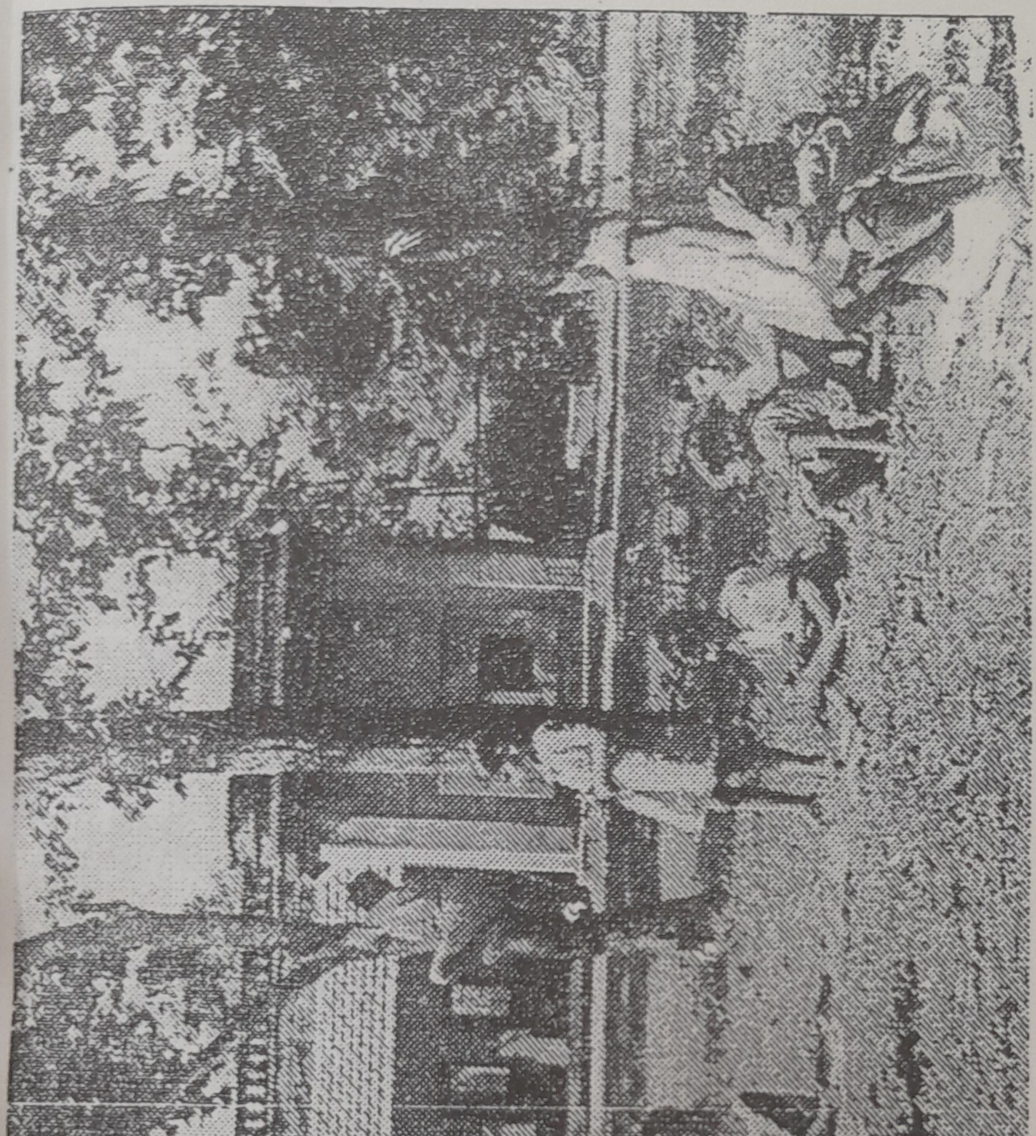

ছবি ঃ রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে

ভোলাকাকাদের গল্প

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

এগুলি কিন্তু নিছকই গল্প। পাঠক এগুলির মধ্যে সত্য খোঁজার চেষ্টা করবেন না।

আমাদের ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে তিনজন ভোলাকাকা ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের নামের আগে একটি করে বিশেষণ যোগ করে আমরা তাঁদের আড়ালে বলতাম ভাবে ভোলা, তালে ভোলা আর ভানে ভোলা কাকা।

ভাবে ভোলা কাকা একবার কলকাতা গেলেন। হাওড়া স্টেশনে নেমে যাদবপুরগামী একটি ডবল ডেকার বাসে উঠলেন। একতলায় সিট খালি নেই দেখে তিনি দোতলায় উঠলেন। যথারীতি শান্তিনিকেতনের নিয়ম মেনে তিনি সিঁড়ির গোড়ায় তাঁর চটি জোড়া ছেড়ে দোতলায় উঠলেন। যাদবপুর পৌঁছে নেমে এসে তিনি তাঁর চটি জোড়া আর খুঁজে না পেয়ে কন্ডাক্টারকে ডেকে বললেন, 'কন্ডাক্টার ভাই, এইখানে আমার চটি জোড়া ছিল, কোথায় গেল?' কন্ডাক্টার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তারপর তার মুখ দিয়ে 'দূর' সহযোগে একটি 'শ'যুক্ত গালাগাল বেরিয়ে এলো। এরকম কাকাকে মাঝে মাঝেই শুনতে হয়।

তালে ভোলা কাকার ছিল বিরাট টাক। একদিন মে মাসের দুপুরে দেখা গেল কাকা চলেছেন পোষ্ট অফিসে চিঠি ফেলতে; বাঁ হাতে তাঁর বন্ধ ছাতা ঝুলছে আর ডান হাতের পোষ্টকার্ডটি দিয়ে দুপুরের চড়চড়ে রোদের হাত থেকে তাঁর টাকটি বাঁচাবার প্রবল চেষ্টা করছেন।

ভানে ভোলা কাকা ছিলেন প্রবল রাবীন্দ্রীক। লম্বা দাড়ি, গোল গোল চশমা, গায়ে মাঝে মাঝেই জোব্বা চড়ত, অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ দিনরাত বই নিয়ে নাড়াবাঁটা করেন। তিনি এতটাই রবীন্দ্রভাবে ভাবিত ছিলেন যে মাঝে মাঝেই ভুল করে নিজের ছেলেকে 'রথী' বলে ডেকে ফেলতেন।

এসব গল্প এখন ইতিহাস। শান্তিনিকেতন আর এখন সেই শান্তিনিকেতন নেই আর ভোলাকাকারাও এখন আর আগের মতো নেই। ভাবে ভোলাকাকা এখন চুল কেটে ফেলেছেন। তিনি এখন লাল রংএর টি সার্ট আর তাপ্পি দেওয়া জিনস্ পরেন। তালে ভোলাকাকা রিটায়ার করে এখন রোজ বুড়োদের সঙ্গে বিকেলবেলা একটা কালভার্টে বসেন আর পেনসন কত পার্সেন্ট বাড়া উচিত সেই নিয়ে আলোচনা করেন। আর ভানে ভোলাকাকা — তাঁকে আর দেখা যায় না। শান্তিনিকেতনের জনারণ্যে তিনি এমনভাবে মিশে গিয়েছেন যে তাঁকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায় না।

পথেই হবে এ পথ চেনা

দেবীকা দত্ত

ঠিক এখানে, এখানটাতে
আমার মনের মাঝে
পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়া
রাজার ছেলে আছে।

রূপকথা নয়, সত্যিকথা
দেখতে পারো খুঁজে —
আমার মনের রাজপুত্তুর
আমার রাজা সে যে।

অচিনপাখী রাজা আমার
ধরা ছোঁওয়ার বাইরে
তাইতো তারে এমনি করে
মনের মাঝে পাই রে।

আজকে যদি অচিন পাখী
যায় আকাশে উড়ে
ক্লান্ত হলে ঠিক সে পাখী
আসবে আবার নীড়ে।

এক-ঠিকানা, এক-নিশানা
একই পরিচয় —
তবু ভিন্ন পথের পথিক মোরা
অবাক বিস্ময় !

ওই পারেতে থাকে রাজা
এই পারেতে আমি —
এমনি ভাবে চলছে মোদের
দুরন্ত পাগলামী।

বিশ্বনাথদার কিল

শুভাশিস মিত্র

অনেকদিনের স্বভাব মতো
বৈতালিকেরও আগে
টুক করে ভাই গাব পেড়ে কিছু
ভরে ফেলি ব্যাগে।

তারপর সারাদিন
যখনই পাই ফাঁক
মিষ্টি গাব বার করি
আর মুখ চলে টুকটাক।

গাবভর্তি ব্যাগের জন্য
ক্লাসে আমি হিরো
পরীক্ষাতেও যখন তখন
পেতাম না আর জিরো।

ছিল আমার চিরশত্রু
ভূপ নারায়ণ সিং
ইচ্ছে করত ওর চোখে
ঘষে দিই শুধু হিং।

ব্যাগ থেকে ভাই
সব গাব আমার
করে নিল চুরি —
রাগে তো আমার
গা কিরমির
লাগে বুঝি মারামারি।

এমন সময় বিশ্বনাথদা
চলে এলেন ক্লাসে
আমরাও সব সুবোধ বালক
বসলাম আশেপাশে।

একটা করে গাব খায় ভূপ
খোসা রাখে আমার পাশে
ক্লাসের সব ছেলেগুলো
খি খি করে হাসে।

একটা একটা করে খোসা
জমছে আমার পাশে
ক্লাস শেষ হলে ভূপকে আমি
আছড়ে ফেলব ঘাসে।

রাগে দুঃখে ভূপের দিকে
যেই ছুঁড়েছি ঢিল
দুড়ুম করে পিঠে পড়ল
বিশ্বনাথদার কিল —
'ক্লাসে বসে গাব খাচ্ছ
আবার মারছ ঢিল!'

কিল খেয়ে ভাই দম আটকে
খাচ্ছি আমি খাবি
চারদিকে দেখছি অনেক
সর্ষে ফুলের ছবি।
ভূপ নারায়ণ ঠ্যাং দুলিয়ে
সবকটা গাব খেল
আর কিল খেলাম আমি
ভাই কেমন বিচার বলো।

কতবার চেয়েছি করতে
এই কিলের প্রতিবাদ
বিশ্বনাথদার লাল চোখ দেখে
সে ইচ্ছে দিয়েছি বাদ।

এমন কিলও খেতে হল
এই সুপ্রিম কোর্টের যুগে
এ দুঃখ ভাই বহু দিন ধরে
চেপে রেখেছি বুকে।

এখন বছর পঁচিশ বাদে
আমি নই হেঁজি পেঁজি
ওজন আমার কম করেও
উনসত্তর কেজি।

আমি জানি বিশ্বনাথদার
বয়সটাও বাড়ছে
হাতে ওনার জোর কমেছে
চুলগুলোও বেশ পাকছে।

কিল মেরে আর আমাকে
করতে পারবে না কুপোকাত
তাই সুযোগ বুঝে এই সভাতেই
জানাই প্রতিবাদ।

তবু কি জানো বয়স বাড়লে
কি আর এমন হয়
এখনও বিশ্বনাথদাকে দেখলে
আমার লাগে কেমন ভয় ভয়।

এরকম কতো শত গল্প আছে
আমাদেরই সবার —
তোমারা আমাকে নেবে কি
ক্লাস টু-তে ভর্তি হই
যদি আবার।

আবার মজায় গাব খাব
ছুঁড়বো দু'একটা ঢিল
পাকে চক্রে না হয়
খেয়ে নেব —
বিশ্বনাথদার কিল।

বাঁধা যে তাঁর সুরে

নীলা দাস

আমাদের ছোটবেলার সেই সব হ'তে আপন আশ্রম সম্মিলনীর কাছ থেকে , পাঠভবনের সাহিত্য সভার জন্য রচনা লেখার অনুরোধ হঠাৎ এসে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বহু বছর পিছনে, যখন রচনা লেখার হাতেখড়ি হয়েছিল পাঠভবনে, আমার নানা বয়সে, নানা পর্যায়ে, শিশুবিভাগ পেরিয়ে মধ্যবিভাগে, মধ্য ছাড়িয়ে আদ্য বিভাগে। ভাবতে গিয়ে মনে হল আমি এখন যা লিখি সে তো আসলে রচনাই। আর যেখানে সেই সব রচনা পড়ি, সেও তো আসলে সাহিত্যসভা। সাহিত্যের উপরে আলোচনা সভা। সে সর্বভারতীয়ই হোক, আর আন্তর্জাতিকই হোক । পাঠভবনের সাহিত্যসভায় বছরের পর বছর যোগ দিতে দিতে নিজের বক্তব্য আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যথাসাধ্য সুন্দর করে প্রকাশ করতে শিখেছিলাম। কবে কি করে শিখে গেলাম কি জানি!

এই প্রসঙ্গে একদিনের কথা বলি। কয়েকবছর আগেকার ঘটনা। ইংল্যান্ডের গ্রাস্মেয়ার কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বাড়ি, ডাভ্ কটেজের কাছে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং তাঁর সমসাময়িক কবিদের সাহিত্যের উপরে বসেছে আন্তর্জাতিক বিরাট আলোচনা সভা। সেখানে আমি একটি রচনা পড়লাম। রচনাটির উপর আলোচনা হল। সভার শেষে আমাকে অবাক করে দিয়ে, ইংল্যান্ডের দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক অধ্যাপিকা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছি কিনা। আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই কথা তাঁদের মনে এল কেন। উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, আমার ইংরেজি উচ্চারণ আর লেখার ভঙ্গী থেকে । শুনে আমার কি গর্ব! মাথা উঁচু করে বলেছিলাম, আমার সমস্ত পড়াশুনা ভারতবর্ষে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। আমার ইংরেজি শেখার প্রথম পর্ব আমার স্কুলে, পাঠভবনে।

মন চলে গিয়েছিল শিশুবিভাগে, কল্যাণীদির ক্লাসে। ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে ইংরেজি পড়তে হত । একটি শব্দেরও উচ্চারণ ভুল হবার জো নেই। যতক্ষণ ঠিক না হচ্ছে, কল্যাণীদি ছাড়তেন না। বড়ো হয়ে ললিতদার ক্লাস। কি যত্ন করে ইংরেজি ব্যাকরণ আর ইংরেজিতে ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী শেখাতেন। দশম শ্রেণীতে যখন পড়ি, এলেন এণ্টনিদা। ব্রিটিশ কাউন্সিল তাঁকে পাঠিয়েছিল। মনে আছে, প্রথম দিনই ক্লাসে

পড়ে শুনিয়েছিলে বিখ্যাত সাহিত্যিক ডি এইচ লরেন্সের 'Snake' কবিতা। কবিতা শেষ হতেই বললেন, সবাই সাপের উপর একটা রচনা লেখ। কোথায় লরেন্স, আর কোথায় আমরা। কিন্তু সবাই লিখেছিলাম। সবার লেখাতেই বেরোল অজস্র ভুল। প্রত্যেকের খাতায় কোন্‌টা কেন ভুল, লিখে ঠিক করে দিলেন। আমরা ভুল সংশোধন করে রচনাটি আবার লিখলাম। আবার একমুঠো ভুল। এমনি করে একই রচনা পাঁচ ছয়বার লেখালেন। তবে সেটি মনের মতো করা গেল। বড়ো হয়ে জেনেছিলাম, একে বলে ড্রাফ্‌ট লেখা। যা মনে এলো লিখে ফেললেই ত রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। তাকে সুন্দর করে তুলতে যে অনেক যত্ন লাগে।

পাঠভবন থেকে কি পেয়েছি বলে কি শেষ করা যায়? গতবছরে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি। একদিন ক্লাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন এল। 'ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সবার সঙ্গে সবার ত শুধুই মারামারি কাটাকোটি। গুজরাটি, বাঙালী, তামিল, তোমরা তো সবাই আলাদা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বলতে তাহলে কি বোঝায়?, উত্তর দিতে গিয়ে মনে পড়ছিল পাঠভবনের দিনগুলিকে। মাস্টারজীর কাছে শিখছি মনিপুরী নাচ, কখনো নাগা নাচের স্টেপিং, নায়ারজীর কাছে কথাকলি। ক্ষমাদির সেলাইয়ের ক্লাসে কাঠিহারী, কাশ্মীরি কাজ। উমাদি, মনীষাদির ইতিহাস ক্লাসে টিপু সুলতান, নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী পড়ে চোখে জল। শিবাজী, লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা পড়তে পড়তে কল্পনা ছুটে চলেছে কোলাপুর আর ঝাঁসির পথ ধরে, রাঙা ঘোড়ায় চড়ে। খৃস্টোৎসবের জন্য ক্যারলের রিহার্সাল, মাঘোৎসবের মন্দিরের মোমবাতির আলো। কোনটা আমার সংস্কৃতি নয়? পাঠভবনে আমরা বাঙালী, মারাঠি, মধ্যপ্রদেশী, নেপালী, হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সব ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বড়ো হয়েছিলাম। কোনোদিন তো কেউ বলেননি মাইকেল আদিবাসী বলে আমাদের থেকে আলাদা বা আসাকা জাপানী বলে আরোই আলাদা। পাঠভবন যে আমাদের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়াবার মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছে, সুদূর আমেরিকায় বসে সেই কথা বারবার মনে হচ্ছিল।

পাঠভবনের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের মতো তোমরাও একদিন বড়ো হয়ে বৃহৎ ক্ষেত্রে গিয়ে দেখবে, পাঠভবন তোমাদের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। সারাক্ষণই সে তোমাদের জীবনের চলার পথ দেখাবে। পাঠভবনের সুরে আমাদের মতো তোমাদেরও মনের তার বাঁধা হয়ে থাকবে। তোমাদের জন্য আমার শুভকামনা রইল।

রস পাটালির নলেন গুড়

গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত থুড়থুড় —
সুগুনী বুড়ি,
চললে কোথা -
আমলা গুলি।
সঙ্গে কে গো —
ছোট্ট লাতি ।
লাতি তো নয়
পুচকে হাতি ।
হাতির মাথায়
নেইকো শুঁড়,
রস পাটালির নলেন গুড় ।

আমি

মীর আফ্রাসিয়ার

সকাল বেলা উঠে আমি
পাঠশালাতে যাই।
টিফিন হলে সবার সঙ্গে
মণ্ডা মিঠাই খাই।

ছুটির ঘণ্টা বাজে যখন
মন ছট্‌ফট্‌ করে তখন।
বাড়ি গিয়ে দাদার সঙ্গে
ক্যারাম খেলা চাই।

আমি যে শক্তিমানের ভাই।

চেনা

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কখন কে ছুঁয়ে দেয়, গায়ে পড়ে ঢিল,
চেনা ভালো ডাক্তার, পুলিশ উকিল।

আনারস, ন্যাসপাতি ইলিশের দাম
উত্তর দক্ষিণ, রাম আর বাম।

চোরা গলি, ভাঙা খাল, মেঠো পথঘাট,
আঙুলের ডগা থেকে পুরো তল্লাট।

বকুল না ক্ষীরকূল, ময়দা না আটা,
বিছুটি না তুলসী, জোয়ার না ভাঁটা।

কোনটা চড়াই আর কোন দিকে ঢাল
কোনটা নিজের হাতে, কোনটা কপাল।

চেনা ভালো কাঁচা ফল, কোন ফল পেকে,
চেনা ভালো দূর থেকে মানুষকে দেখে।

যার যত কাছে যাই, মনে হয় চিনি,
চিনি আর ভুলে যাই, ভুলে যাই, চিনি।

ক্ষতিপূরণ

জয়সিং রাঠোর

'কালোদা নমস্কার। আমি আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদিকা, নাম মৃদঙ্গমোহিনী সমাদ্দার। আমি সম্পাদক, নাম ভুজঙ্গভূষণ সেনাপতি । শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্যসভায় আপনাকে লেখা দিতে হবে।'

ঘরে বসে সাহিত্য সভায় পড়ার সুযোগ, এ কি ছাড়া যায়। বললাম তথাস্তু। কিন্তু কথা দাও বাতিল করবে না। লেখাটা যদি না উতরায় যথেচ্ছ ছুরি কাঁচি চালাতে পারো। তাতেও যদি দাঁড় না করানো যায় তবে গিলোটিনে ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ কোরো, কিংবা তোমাদের কারও লেখা আমার নামে চালিয়ে দিয়ো।

সেদিন যা লিখেছিলাম আর আজ যা পড়ছি তার মধ্যে কোন মিল নেই। লিখেছিলাম বারো পাতা রয়ে গেছে দেড় পাতা। লিখেছিলাম কমেডি, হয়ে গেছে ট্রাজেডি । তবু আমি তোমাদের কাছে ঋণী। জীবনে এই প্রথম আর এই শেষ সাহিত্য সভায় পড়া।

শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তোমরা সমীক্ষা করবে পাঠভবন কী পেয়েছে, কী হারিয়েছে। কিন্তু আমার জীবনীর কিয়দংশ না শুনলে সেই সমীক্ষা পূর্ণাঙ্গ হবে কি না সন্দেহ করি। তাই কয়েকটি কথা বলছি।

১লা জুলাই ১৯৪২ থেকে ১০ই জুলাই ১৯৬০ এই দীর্ঘ ১৮ বছর ১০ দিন পাঠভবনে পড়েছি। পড়ায় ফাঁকি দিই নি, নকল করিনি, মারপিট করিনি। ইংরাজীতে যাকে বলে Spotless। তবু আমাকে তাড়ানো হয়েছিল। তাতে পাঠভবনের কোন ক্ষতি হয়েছিল কি না, শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সেটা চিন্তার বিষয়।

১৮ বছরে আমার প্রথম সহপাঠী, ধলো, মানে অমর্ত্য সেন আর শেষ সহপাঠী মনোরঞ্জন ঘোষ মানে খোকাদা। এদের মাঝখানে কার সঙ্গে কবে পড়েছি, কতবার একই ক্লাসে পড়েছি মনে নেই। এও মনে নেই সুপ্রিয় ঠাকুর আগে এসেছিল না সুব্রত সেনমজুমদার, অনাথ দাস না আলো দত্ত।

ক্লাস ফাইভে প্রথম হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম সেদিন থেকে ম্যারাডোনার মতো ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ১৫ বছর পর পৌঁছালাম ম্যাট্রিকে । একে একে অমর্ত্য, মুনিয়া, সুপ্রিয় এমনকি অনাথ, খোকাও ম্যাট্রিক পাশ করে বেরিয়ে গেল। আমি ৪ বার ফেল করেও হাল ছাড়িনি। নিষ্ঠার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ১০ই জুলাই ১৯৬০ অধ্যক্ষ মশাই বললেন, 'বাবা কালো, নিয়ম পাল্টেছে। তিনবারের বেশি হস্টেলে থেকে

ম্যাট্রিক দেওয়া যায় না। গতবার ফস্কে গিয়ে তুমি চারবার দিয়ে ফেলেছ। এবার এসো বাবা।' সেই হস্টেলে আমার শেষ দিন।

বাড়িতে আমি কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছি। আমার বংশধররা গাঁয়ের ইস্কুলেই পড়বে, কেউ পাঠভবনে যাবে না। গাঁয়ে যতবার ইচ্ছে পরীক্ষা দেয়া যায়, পাঠভবনে সেটা সম্ভব নয়। আর আমার বংশে এমন কেউ জন্মাবে না যে দু'একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে।

আমার ও পাঠভবনের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে ১০ই এপ্রিল আমার হার্ট এ্যাটাক হয়। খবর কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল হরিয়ানার খড়্গধারী সিং ধিঙ্গড়া ৩৬ বার ফেল করে এ বছর ম্যাট্রিক পাশ করছে। গিনেজ বুকে তার নাম উঠেছে। এ হার্ট এ্যাটাক থেকে বেঁচে যেতাম যদি সেদিন অধ্যক্ষ মশাই পিঠ থাবড়ে বলেতেন, শাবাস কালো, চালিয়ে যাও, অনেক অঘটন আজও ঘটে, কালও ঘটতে পারে। তাহলে হয়ত এই ৪১ বছরের মাথায় আমিও ম্যাট্রিক পাশ করে ফেলতুম। আমার সঙ্গে পাঠভবনের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা হত গিনেজ বুকে।

পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, দেশিকোত্তম এমনকি নোবেলও পেয়েছে পাঠভবন। কিন্তু গিনেজ বুকে আজও স্থান পায়নি কাল তো পাবেই না। আমি নিজে কী পেয়েছি কী হারিয়েছি সেটা না হয় উহ্যই রইল। কারণ কপালে নেই কো ঘি ঠকঠকালে হবে কি?

মোদ্দা কথা — আজ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তোমরা বিচার করে দেখো সেদিন অধ্যক্ষ মশাই নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে আমাকে তাড়িয়ে কি ঠিক করেছিলেন? পাঠভবনের ক্ষেত্রে কি সেটা হিতে বিপরীত হয় নি? গিনেজ বুক থেকে আমার সঙ্গে পাঠভবনের নামও যে চিরকালের মতো বাদ পড়ল এই ক্ষতি কি কখনও পূরণ করা যাবে।

আশ্রম বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কার্যাবলী

২৩ ডিসেম্বর ২০০০	আশ্রম বিদ্যালয় পাঠভবনের শতবর্ষ সূচনা উৎসব স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ : ১। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় (১৯০১-২০০১) ২। Santiniketan Vidyalaya (1901-2001)	আম্রকুঞ্জ
২৩-২৫ ডিসেম্বর ২০০১	প্রদর্শনী : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শতবর্ষ আলোকসজ্জা ও বৈতালিক	পৌষমেলা
৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১	প্রদর্শনী : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শতবর্ষ	মাঘমেলা
১৪ এপ্রিল ২০০১	চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য (দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত)	গৌরপ্রাঙ্গণ
২৮ এপ্রিল ২০০১	নাটক ক্ষীরের পুতুল (শিশু ও মধ্যবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত)	নাট্যঘর
জুন ২০০১	'দিনলিপি' শতবর্ষ সংকলন প্রকাশ	
১৬ জুলাই ২০০১	বর্ষা কবিতাপাঠের আসর ও বিশ্বভারতীতে পাঠরত পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর	নাট্যঘর
৭ সেপ্টেম্বর ২০০১	শিক্ষকদিবস উপলক্ষে আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের (১৯০১-'৪১) পরিচয় সহ ছবির প্রদর্শনী	
১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১	পাঠভবনের বর্তমান এবং প্রাক্তনদের মিলিত সাহিত্যসভা	সিংহসদন

৩ অক্টোবর ২০০১	নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	কলামন্দির, কোলকাতা
১৩ অক্টোবর ২০০১	আলোচনাচক্র : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়স্তরে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা	নাট্যঘর ও সিংহসদন
২০ ডিসেম্বর ২০০১	গ্রাম পরিদর্শন। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার দিবস এবং বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে বিনুড়িয়া গ্রামে নূতন লাইব্রেরি উদ্বোধন সেইসঙ্গে আশ্রম সম্মিলনীর সেবাবিভাগের পক্ষ থেকে জাগৃতি সংঘকে আনুমানিক দশ হাজার টাকার স্টীলের পুস্তক-তাক ও ১৩৭টি গ্রন্থ প্রদান	বিনুড়িয়া
২৩ ডিসেম্বর ২০০১	শতবর্ষপূর্তি উৎসব	আম্রকুঞ্জ
	আমাদের লেখা (শতবর্ষ সংকলন) প্রকাশ	
	আলোকসজ্জা ও বৈতালিক	গৌরপ্রাঙ্গণ
	প্রদর্শনী : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শতবর্ষ	পৌষমেলা

শতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রভবন প্রকাশিত গ্রন্থ -

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ, Makers of the Mission

বিশ্বভারতী কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড -

শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ ক্যালেন্ডার প্রকাশ

প্রচ্ছদ : সায়ন্তন দে, পঞ্চম শ্রেণী